৩.১ ভারতীয় সংবিধানের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য
Salient features of the Indian Constitution

পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই একটি করে সংবিধান থাকতে দেখা যায়। কোথাও লিখিত, কোথাও অলিখিত। স্বাধীন ভারতের জন্য ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর যে সংবিধানটি গ্রহণ করা হয়, সেটি দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার প্রতিফলন এবং জাতীয় আদর্শ ও লক্ষ্যসমূহের ইস্তেহারস্বরূপ। এই সংবিধানের ওপর ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আয়ারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের সংবিধানের সুস্পষ্ট প্রভাব থাকলেও নানাদিক থেকে এটি অভিনবত্ব দাবি করতেও পারে। নীচে ভারতীয় সংবিধানের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হল :

(১) পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সংবিধান : ভারতের সংবিধান পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম লিখিত সংবিধান। মূল সংবিধানে একটি প্রস্তাবনাসহ ৩৯৫টি ধারা, নানা উপধারা এবং ৮টি তপশিল ছিল। পরবর্তীকালে সংবিধান বহুবার সংশোধিত হয়েছে এবং বেশ কিছু নতুন উপধারা ও তপশিল সংযোজিত হয়েছে। বর্তমান সংবিধানে মোট ৩৯৫টি ধারাই রয়েছে, তবে তপশিল-এর সংখ্যা ৮ থেকে বেড়ে ১২ হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে মূল মার্কিন সংবিধানে মাত্র ৭টি ধারা সহ ৪,০০০-এর মতো শব্দ ছিল। বর্তমানে এর আকার কিছুটা বাড়লেও ভারতের তুলনায় অনেক কম। ভারতের সংবিধানটি বৃহৎ হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাংবিধানিক অভিজ্ঞতা থেকে নানা বিধিবিধান সংগ্রহ করে তা ভারতীয় সংবিধানে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। এ ছাড়া দেশের ভূখণ্ড, নাগরিকতা, নাগরিক অধিকার, সরকারি ভাষা, জরুরি অবস্থা, সংবিধান সংশোধন, কেন্দ্র-রাজ্য ক্ষমতাবণ্টন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় এত বিস্তৃতভাবে সংবিধানে সন্নিবিষ্ট হয়েছে যা অন্য কোনো দেশের সংবিধানে দেখা যায় না।

(২) লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের সংমিশ্রণ : ভারতীয় সংবিধান মূলত লিখিত হলেও এর মধ্যে অলিখিত সংবিধানের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। প্রথা, শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি প্রভৃতি ভারতীয় সংবিধানে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। উদাহরণস্বরূপ লোকসভায় কোনো সরকারি বিলের ওপর ভোটগ্রহণের সময় সরকার পক্ষের পরাজয় ঘটলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হবে—সংসদীয় গণতন্ত্রের এই প্রথাটি ভারতীয় সংবিধানে লিখিত অবস্থায় নেই।

(৩) প্রস্তাবনা : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের অনুকূলে ভারতীয় সংবিধানে একটি প্রস্তাবনা সংযোজিত হয়েছে। এই প্রস্তাবনাতে সংবিধানের উৎস, নৈতিক আদর্শ ও মূল লক্ষ্য সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া আছে। প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস ও উপাসনার স্বাধীনতা, প্রত্যেক ব্যক্তির সমমর্যাদা এবং সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠার কথা প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে। প্রস্তাবনাটি সংবিধানের কার্যকরী অংশের অন্তর্ভুক্ত নয় বলে আইনগত দিক থেকে এর কোনো গুরুত্ব নেই, কিন্তু কার্যকরী অংশের কোনো শব্দ বা বাক্যের অর্থ স্পষ্ট না থাকলে প্রস্তাবনার সাহায্যে তা পরিষ্কার করে নেওয়া যায়।

(৪) সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র : ভারতবর্ষ একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয়দিক থেকেই ভারতবর্ষ সকলপ্রকার নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত। ভারত স্বাধীনভাবে অভ্যন্তরীণ নীতি নির্ধারণ

করতে পারে। দেশের অভ্যন্তরে সকলেই রাষ্ট্রীয় আইন মেনে চলতে বাধ্য। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ভারত ইচ্ছামতো অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে এবং স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে পারে।

মূল সংবিধানে উল্লিখিত না থাকলেও ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় সমাজতান্ত্রিক **আদর্শকে** স্থান দেওয়া হয়েছে। অবশ্য ঠিক কী ধরনের সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে গ্রহণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি। সাধারণভাবে সমাজতন্ত্র বলতে বোঝায় সমাজের উৎপাদনের উপায়গুলির ওপর সামাজিক মালিকানা এবং উৎপন্ন সামাজিক দ্রব্যাদি সামাজিক মালিকানায় বণ্টন। ভারতে এই অর্থে সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে গ্রহণ করা হয়নি। এখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে সংবিধান কর্তৃক সুরক্ষিত করা হয়েছে। মিশ্র অর্থব্যবস্থাকে (Mixed economy) সরকারের অর্থনৈতিক নীতি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কারও কারও মতে, ভারতে মার্কসীয় **সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে** গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের **আদর্শকে গ্রহণ করা হয়েছে।**

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি **ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র** বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম রূপকার **আয়েঙ্গার** (G. Ayyangar) বলেন, "ধর্মনিরপেক্ষ বলতে আমরা একথা বোঝাতে চাইছি না যে, কোনো ধর্মের প্রতি আমাদের বিশ্বাস নেই এবং আমাদের জীবনের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। ধর্মনিরপেক্ষ কথাটির অর্থ হল রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মকে সাহায্য বা পৃষ্ঠপোষকতা করবে না এবং এক ধর্ম অপেক্ষা অন্য ধর্মকে প্রাধান্য দেবে না।" এই ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সংবিধানের ২৫-২৮ নং ধারাগুলিতে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

ভারত **একটি গণতান্ত্রিক দেশ**। এখানে জনগণ তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া সংবিধানে জনগণের বাক্ ও মতামত প্রকাশের অধিকার, সংঘ-সমিতি গঠন করার অধিকার প্রভৃতি স্বীকৃতি লাভ করেছে। তবে এখানে গণতন্ত্র মূলত রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য, শোষণ, দারিদ্র্য ইত্যাদি বিরাজ করায় গণতন্ত্রকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্র পর্যন্ত প্রসারিত করা হয়নি।

প্রস্তাবনায় ভারতকে **'সাধারণতন্ত্র'** হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। সাধারণতন্ত্র বলতে এমন একটি রাষ্ট্রকে বোঝায় যেখানে রাষ্ট্রপ্রধান উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা অর্জন করেন না এবং যেখানে শাসনক্ষমতা জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ন্যস্ত করা হয়। ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রপতি জনসাধারণ কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত, ইংল্যান্ডের রাজা বা রানির ন্যায় বংশানুক্রমিক শাসক নন। তবে ভারত কমনওয়েলথ-এর সদস্যভুক্ত হওয়ায় অনেকে এর সাধারণতান্ত্রিক চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

(৫) ব্রিটিশ রাজের উত্তরাধিকার : একটি দেশের সংবিধান সেই দেশের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের অনিবার্য বিবর্তনের ফল ছাড়া কিছুই নয়। ব্রিটিশরা এখানে প্রায় ২০০ বছর রাজত্ব করেছে। স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীন ভারতের সংবিধানের ওপর ব্রিটিশ রাজ্যের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা, সংসদীয় শাসনব্যবস্থা, বিচার বিভাগীয় পুনরীক্ষণ বা পর্যালোচনা ইত্যাদি ভারতীয় সংবিধানের তিনটি মৌলিক উপাদানই পূর্ববর্তী ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা থেকে গৃহীত। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে কেন্দ্রে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা না থাকলেও রাজ্যগুলিতে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থার প্রচলন ছিল। তবে এর মানে এই নয় যে ভারতীয় সংবিধানের নতুনত্ব বলে কিছু নেই। বস্তুত স্বাধীন ভারতীয় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতে গিয়ে ভারতীয় সংবিধানকে আগের থেকে অনেক বেশি গণতান্ত্রিক হতে হয়েছে।

(৬) নমনীয় ও অনমনীয় সংবিধানের সংমিশ্রণ : ভারতীয় সংবিধানের সকল অংশ একই পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা যায় না। তিনটি ভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে সংশোধন করা যায়। সংবিধানের কিছু অংশ রয়েছে যেগুলি সাধারণ আইন প্রণয়নের পদ্ধতিতে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে সংশোধন করা যায়, যেমন নতুন রাজ্যের গঠন বা পুনর্গঠন, পুরাতন রাজ্যের নাম বা সীমানা পরিবর্তন, রাজ্য-আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষের সৃষ্টি বা অবলুপ্তি, সাংসদদের বিশেষাধিকার, বেতন, ভাতা ইত্যাদি। কিছু অংশ রয়েছে যেগুলি সংশোধন করতে পার্লামেন্টের প্রতিটি কক্ষের মোট সদস্যের অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন প্রয়োজন, যেমন—মৌলিক অধিকার, নির্দেশমূলক নীতিসমূহ ইত্যাদি। আবার সংবিধানের

এমন কতকগুলি বিষয় রয়েছে যেগুলি সংশোধন করতে পার্লামেন্টের উভয়-কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন ছাড়াও রাজ্য আইনসভাগুলির অন্তত অর্ধেকের সমর্থন প্রয়োজন। যেমন—রাষ্ট্রপতির নির্বাচন, কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন, পার্লামেন্টে রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব, সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি ইত্যাদি।

উপরিউক্ত তিনটি পদ্ধতির মধ্যে প্রথম পদ্ধতিটি অত্যন্ত সাধারণ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদ্ধতি দুটি অপেক্ষাকৃত জটিল। তাই ভারতের সংবিধানকে এককথায় ব্রিটেনের ন্যায় নমনীয় বলা যায় না, আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় অনমনীয় বলা যায় না। ভারতীয় সংবিধানে নমনীয়তা ও অনমনীয়তার মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করা হয়েছে।

(৭) যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং এককেন্দ্রিক ব্যবস্থার সমন্বয় : লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান, কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে সংবিধান কর্তৃক ক্ষমতা বণ্টন, নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের অবস্থিতি প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতে বিদ্যমান। সুতরাং ভারত যে আকার-প্রকারের দিক থেকে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে কেন্দ্রকে এত বেশি শক্তিশালী করা হয়েছে এবং রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল করা হয়েছে যে, প্রকৃতিগতভাবে ভারতকে যুক্তরাষ্ট্রীয় বলা যায় না। সংবিধান কর্তৃক নির্দিষ্ট বিভিন্ন তালিকার মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হলেও, কেন্দ্র নানা ক্ষেত্রে রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে এবং রাজ্যের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও রাজ্যগুলিকে বড়ো বেশি কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল করে রাখা হয়েছে। এ ছাড়া কেন্দ্র কর্তৃক রাজ্যগুলিকে নির্দেশদান, রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা, অখণ্ড বিচারব্যবস্থা, সংবিধান সংশোধনে পার্লামেন্টের প্রাধান্য, প্রভৃতি বিষয়গুলি সুস্পষ্টভাবে কেন্দ্রীয় প্রবণতার সাক্ষ্য বহন করে। এই অস্বাভাবিক কেন্দ্র-প্রবণতা লক্ষ করে প্রখ্যাত সংবিধান-বিশারদ **দুর্গাদাস বসু** বলেছেন, ভারতকে এককভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় বা এককেন্দ্রিক না বলে 'উভয়ের সমন্বয়' (a combination of both) বলাই যুক্তিযুক্ত।

(৮) সংসদীয় শাসনব্যবস্থা : ইংল্যান্ডের অনুকরণে ভারতবর্ষে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা বা মন্ত্রিপরিষদ-চালিত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একজন নিয়মতান্ত্রিক শাসকের উপস্থিতি, আইনসভার কাছে মন্ত্রিপরিষদের দায়িত্বশীলতা, আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা জোটের নেতা বা নেত্রী হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব, ক্যাবিনেটের প্রাধান্য, আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রভৃতি সংসদীয় শাসনব্যবস্থার সমস্ত বৈশিষ্ট্য ভারতে বর্তমানে রয়েছে। তবে ইংল্যান্ডের সংসদীয় শাসনব্যবস্থার সবকিছু বৈশিষ্ট্য এখানে অনুসরণ করা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রপ্রধান রাজা বা রানির পদটি বংশানুক্রমিক, কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রপতির পদটি বংশানুক্রমিক নয় ; সংবিধান অনুযায়ী দেশের যাবতীয় শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত। এইভাবে ভারতে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থার মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করা হয়েছে।

(৯) মৌলিক অধিকার : ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে নাগরিকদের ছয় প্রকার মৌলিক অধিকার প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এগুলি মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য এবং গণতান্ত্রিক সমাজ-গঠনের জন্য অপরিহার্য। তা ছাড়া এইসব অধিকার আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্যও বটে। মৌলিক অধিকারগুলি হল— (ক) সাম্যের অধিকার, (খ) স্বাধীনতার অধিকার, (গ) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, (ঘ) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, (ঙ) সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার এবং (চ) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার। বলা বাহুল্য, অধিকারগুলি অবাধ নয়। বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে অধিকারগুলির ওপর বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে। তা ছাড়া রাষ্ট্র প্রয়োজনমতো অধিকারগুলির ওপর 'যুক্তিসংগত' বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে।

(১০) মৌলিক কর্তব্য : ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকদের ১০টি মৌলিক কর্তব্যের কথা বলা হয়। অতঃপর ২০০২ সালে প্রণীত ৮৬তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ওইসব কর্তব্যের সঙ্গে আর-একটি কর্তব্য যোগ করা হয়। এইসব কর্তব্য মৌলিক অধিকারের অংশে সংযুক্ত না করে সংবিধানের চতুর্থ অংশে বর্ণিত নির্দেশমূলক নীতিগুলির সঙ্গে যোগ করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই কর্তব্যগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়। তবে নাগরিকদের মধ্যে ঐক্য ও স্বদেশপ্রীতির মনোভাব জাগ্রত করার ব্যাপারে এগুলির একটা মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য রয়েছে সন্দেহ নেই। যাই হোক, **মৌলিক কর্তব্যগুলি হল** সংবিধান মান্য করা এবং সংবিধানের আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা ; স্বাধীনতা

সংগ্রামের মহান আদর্শগুলি সযত্নে লালন ও অনুসরণ করা ; ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করা ইত্যাদি।

(১১) নির্দেশমূলক নীতি : আয়ারল্যান্ডের সংবিধানের অনুকরণে ভারতীয় সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে ৩৬ থেকে ৫১নং ধারাগুলিতে কতকগুলি রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্দেশমূলক নীতির উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, রাষ্ট্র এমনভাবে তার নীতিগুলি পরিচালনা করবে যাতে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিক পর্যাপ্ত জীবিকা অর্জনের সুযোগ পায় এবং উৎপাদনের উপায়গুলি যেন মুষ্টিমেয়র হাতে কেন্দ্রীভূত না হয় ; বেকার, বৃদ্ধ ও অসুস্থ অবস্থায় নাগরিকগণ সরকারি সাহায্য লাভ করবে ; রাষ্ট্র সমাজের দুর্বল এবং অনুন্নত অংশের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রসার ঘটাবে ; রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হবে ইত্যাদি। এইসব নীতি মৌলিক অধিকারের ন্যায় আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়। তবে নাগরিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এবং জনকল্যাণকর সমাজগঠনের পক্ষে এগুলি অপরিহার্য।

(১২) বিচারালয়ের প্রাধান্য এবং পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্বের মধ্যে সমন্বয় : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচার বিভাগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মার্কিন কংগ্রেস প্রণীত কোনো আইন যদি সংবিধান বিরোধী হয় অথবা অযৌক্তিক বা ন্যায়নীতি বিরোধী হয়, সুপ্রিমকোর্ট তা বাতিল করে দিতে পারে। অপরদিকে, ব্রিটেনে পার্লামেন্ট হল সার্বভৌম। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যে-কোনো আইন প্রণয়ন করতে পারে, যে-কোনো আইন বাতিল করতে পারে এবং পার্লামেন্ট প্রণীত আইনকে কেউ বাতিল করতে পারে না। কিন্তু ভারতে বিচারালয়ের প্রাধান্য এবং পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব—এ দুটির মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে সংবিধানের অভিভাবক ও মৌলিক অধিকারের সংরক্ষক হিসাবে সুপ্রিমকোর্টের ভূমিকাকে স্বীকার করা হয়েছে। ভারতীয় সুপ্রিমকোর্ট পার্লামেন্ট প্রণীত আইনের বৈধতা বিচার করতে পারে এবং পার্লামেন্ট প্রণীত কোনো আইন সংবিধান বিরোধী হলে তা বাতিল করে দিতে পারে। কিন্তু মার্কিন সুপ্রিমকোর্টের মতো ভারতীয় সুপ্রিমকোর্ট আইনের যৌক্তিকতা বা গুণাগুণ বিচার করতে পারে না। কোনো আইন সংবিধানসম্মত হলে, তা সে যত অযৌক্তিক হোক না কেন, ভারতীয় সুপ্রিমকোর্ট তা বাতিল করতে পারে না।

(১৩) বিশেষ সংরক্ষণ ব্যবস্থা : ভারতীয় সংবিধানে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে অনুন্নত শ্রেণির উন্নতি বিধানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সংবিধানের ৩৩০ থেকে ৩৪০ নং ধারাগুলিতে তফশিলিভুক্ত জাতি, উপজাতি ও ইঙ্গ-ভারতীয়দের জন্য বিশেষ সুযোগসুবিধার কথা বলা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আইন সভায় আসন সংরক্ষণ, সরকারি চাকরিতে পদ সংরক্ষণ, শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ আনুকূল্য প্রদান প্রভৃতি বিশেষ সুযোগসুবিধার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

(১৪) এক-নাগরিকত্ব : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় ভারতে দ্বি-নাগরিকত্ব স্বীকার করা হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন নাগরিক একাধারে সমগ্র দেশের নাগরিক এবং যে রাজ্যে সে বসবাস করে সেই রাজ্যের নাগরিক। ভারতে জনগণ শুধুমাত্র ভারতীয় রাষ্ট্রের নাগরিক। এখানে পৃথকভাবে অঙ্গরাজ্যের নাগরিকত্ব স্বীকার করা হয়নি। অর্থাৎ, যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশ হওয়া সত্ত্বেও ভারতে এক-নাগরিকত্ব প্রবর্তিত আছে।

(১৫) জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ব্যবস্থা : সংকটকালীন অবস্থা মোকাবিলার জন্য ভারতীয় সংবিধানে জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ব্যবস্থা সন্নিবেশিত হয়েছে। রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৩৫২, ৩৫৬ এবং ৩৬০নং ধারা অনুসারে যথাক্রমে জাতীয় জরুরি অবস্থা, রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থাজনিত জরুরি অবস্থা এবং আর্থিক জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। জরুরি অবস্থা ঘোষণার ফলে একদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ও প্রাধান্য বেড়ে যায় এবং অন্যদিকে রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য ও ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়।

(১৬) সংবিধানের প্রাধান্য : ভারতীয় সংবিধানের কোথাও সংবিধানকে দেশের সর্বোচ্চ আইন বলে বর্ণনা করা না হলেও পরোক্ষভাবে সংবিধানের প্রাধান্য স্বীকার করা হয়েছে। সরকারের প্রতিটি বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানকে সংবিধানের নির্দেশ মেনে কাজ করতে হয়। শাসন বিভাগীয় কোনো নির্দেশ অথবা আইন বিভাগ প্রণীত কোনো আইন সংবিধান বিরোধী হলে সুপ্রিমকোর্ট তা বাতিল করে দিতে পারে। তা ছাড়া ভারতের রাষ্ট্রপতি, অঙ্গরাজ্যগুলির রাজ্যপাল প্রমুখকে নিজ নিজ কার্যভার গ্রহণের পূর্বে সংবিধান মেনে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়।

(১৭) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অনুপস্থিতি : ভারতের সংবিধান সরকারের তিনটি বিভাগের ক্ষমতার এক্তিয়ার নির্ধারণ করে দিয়েছে, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুসরণ করেনি। বরং ব্রিটেনের ন্যায় বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে নির্ভরশীলতা ও সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। ভারতের রাষ্ট্রপতি একই সঙ্গে শাসন বিভাগের প্রধান এবং আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ক্যাবিনেট সদস্যদের অতি অবশ্যই পার্লামেন্টের সদস্য হতে হয়। বিচারপতিগণ নিযুক্ত হন শাসন বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। মন্ত্রিপরিষদকে তার কাজের জন্য আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকতে হয়। লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হলে অথবা সরকারি বিল প্রত্যাখ্যাত হলে মন্ত্রিপরিষদকে পদত্যাগ করতে হয়।

(১৮) ভাষা সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ : ভারতে অন্তত ৮৪৫টি ভাষাভাষীর লোক রয়েছে। এই বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে যাতে ঐক্য ও সংহতি বজায় থাকে তার জন্য সংবিধানে বিস্তারিতভাবে ভাষা-সংক্রান্ত বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। সংবিধানের সপ্তদশ অংশে ৩৪৩-৩৫১ নং ধারাগুলিতে রাষ্ট্রীয় ভাষা, আঞ্চলিক ভাষা, আদালতে ব্যবহৃত ভাষা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তৃত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের অষ্টম তপশিলে বর্তমানে মোট ২২টি ভাষাকে স্থান দেওয়া হয়েছে। সর্বশেষ সংযোজিত ৪টি ভাষা হল বোরো, ডোগরি, সাঁওতালি এবং মৈথিলি।

(১৯) সর্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত : প্রস্তাবনায় ঘোষিত গণ-সার্বভৌমিকতার নীতিটিকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় সংবিধানের ৩২৫নং এবং ৩২৬নং ধারায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্পত্তি, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ২১ বছর বয়স্ক প্রতিটি ভারতীয় নাগরিককে ভোট দানের অধিকারী করা হয়েছে। ১৯৮৮ সাল থেকে এই বয়সসীমা কমিয়ে ১৮ বছর করা হয়েছে।

(২০) বিশ্বশান্তির আদর্শ : ভারতীয় সংবিধানে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সংবিধানের ৫১নং ধারায় ঘোষণা করা হয়েছে, ভারত আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় সচেষ্ট হবে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিবাদ মীমাংসার চেষ্টা করবে। শান্তিবাদের আদর্শের সঙ্গে সংগতি রেখে ভারত পঞ্চশীল চুক্তি সম্পাদন করেছে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জোট নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করেছে।

(২১) জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের আদর্শ : ভারতীয় সংবিধানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ এদুটি আদর্শের কোনোটিকেই এককভাবে গ্রহণ করা হয়নি, বরং এই দুয়ের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা করা হয়েছে। তাই ভারতীয় সংবিধানে একদিকে যেমন ব্যক্তিগত সম্পত্তি, বেসরকারি উদ্যোগ ও উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ব্যবস্থা রয়েছে, অপরদিকে তেমনি সরকারি উদ্যোগ, পরিকল্পিত অর্থনীতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতিশ্রুতি প্রভৃতির ব্যবস্থা রয়েছে।

(২২) কিছু রাজ্যের জন্য বিশেষ সাংবিধানিক ব্যবস্থা : ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশ এবং সংবিধানের ১৪ নং ধারায় আইনের দৃষ্টিতে সমানাধিকারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মূল সংবিধানেই তিনটি রাজ্যের জন্য বিশেষ সাংবিধানিক মর্যাদা দানের কথা বলা হয়, যথা আসাম, নাগাল্যান্ড এবং জম্মু ও কাশ্মীর।। পরবর্তীকালে ১৯৭৪-১৯৭৯ সালের মধ্যে আরও ৫টি রাজ্যকে বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন রাজ্য (Special Cetegory Status—SCS) হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। রাজ্যগুলি হল (১) হিমাচলপ্রদেশ, (২) মণিপুর, (৩) মেঘালয়, (৩) সিকিম এবং (৫) ত্রিপুরা। এই রাজ্যগুলি, বিশেষ করে জম্মু ও কাশ্মীর, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় কিছু বাড়তি অধিকার ভোগ করত। উদাহরণস্বরূপ জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য আলাদা সংবিধান ছিল এবং অন্যান্য বিশেষাধিকার ছিল। তবে ২০১৯ সালে কেন্দ্রের মোদী সরকারের আমলে জম্মু ও কাশ্মীরের এই বিশেষ মর্যাদা তথা অধিকার (SCS) পার্লামেন্টে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে তুলে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, উক্ত আইন অনুযায়ী জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যটিকে ভেঙে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে রূপান্তর করা হয়—একটি জম্মু ও কাশ্মীর, অপরটি লাদাখ।

উপসংহার : উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতাগণ যতখানি ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, ততখানি সাবেকি সোভিয়েত ইউনিয়ন বা চিনের ন্যায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হননি। জওহরলাল নেহরু গণপরিষদে সংবিধানের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত যে প্রস্তাবগুলি উত্থাপন করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে যার অধিকাংশই সংবিধানে স্থান পেয়েছিল, সেটি ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আদর্শেরই একটি দলিল। ওই প্রস্তাবের মধ্যে আইনের

দৃষ্টিতে সমতা, সকলের সমান সুযোগ লাভ, বিভিন্ন প্রকার সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ও ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা, সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আদর্শগুলি স্থান পেয়েছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার বিষয়টি উক্ত প্রস্তাবে উল্লেখযোগ্যভাবে অনুপস্থিত ছিল। ভারতীয় সংবিধানের অর্থনৈতিক ভিত্তি যে বুর্জোয়া সামন্ততান্ত্রিক দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ পাওয়া যায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতিদানের মধ্যে। পরিশেষে **ড. শোভনলাল দত্ত গুপ্তের** সঙ্গে একমত হয়ে বলা যায়, "ভারতীয় সংবিধান মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী মানুষের অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্য যাবতীয় আইনগত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করেছে, অথচ সাধারণ মানুষের প্রতি দায়দায়িত্বের ব্যাপারে নীরব থেকেছে" (*"The Constitution made way for a legal guarantee of the defence of the economic rights of the privileged few as against the obligation of the state towards the people" –Justice and the Political Order in India.)*।